বেঙ্গল টাইমস

২৫ মার্চ, ২০২৪

- জোটে এত জট কেন?
- কুকথার স্রোত কে থামাবে?
- গঙ্গার নীচে মেট্রো যাত্রা
- বোর্ডকে কে শাস্তি দেবে
- পলাশ দেখেই ছুটবেন না

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in

সম্পাদকীয়

বসন্তে ভোটের দামামা

দেখতে দেখতে শীত ফুরিয়ে গেল। ঋতুচক্রের নিয়মে শীত শেষ মানেই বসন্ত। জঙ্গলমহলে পলাশ যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সেই হাতছানিতে সাড়া দিয়ে অনেকেই ছুটে যাচ্ছেন জঙ্গলমহলে। কিন্তু ঋতুচক্র যতই বসন্তের কথা বলুক, এ যেন গরমেরই পূর্বাভাস।

এদিকে, ভোটের দামামাও বেজে গেছে। রাজ্যজুড়ে, দেশজুড়ে শুরু হয়ে গেছে প্রচার পর্ব। রাজ্যের শাসক তো একেবারে ব্রিগেড থেকেই র‍্যাম্প শো-তে হাঁটিয়ে প্রার্থীঘোষণা করে দিয়েছে। বাকি দলগুলি অনেকটাই পিছিয়ে। বিজেপি যেমন অর্ধেকের ওপর আসনে এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি, তেমনই বাম-কং-আইএসএফ জোটে এখনও নানা জটিলতা। জোট নিয়ে এত জট কেন, প্রশ্ন উঠতেই পারে।

রাজ্যে কারা কত আসন পাবে, তা নিয়ে নানা মহলে চর্চা শুরু হয়ে গেছে। যত দিন যাবে, ছবিটা আরও স্পষ্ট হবে। দেশের ক্ষেত্রে বিরোধীরা অনেকটাই ছত্রভঙ্গ। স্বাভাবিক নিয়মেই শাসকদল অনেক এগিয়ে। নরেন্দ্র মোদির তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসা একরকম নিশ্চিত।

এসব আগাম হিসেব থাক। যে যার মতো করে প্রচার করুক। কুকথা আর হিংসায় লাগাম টানুক বিভিন্ন দল। শাসকের দায় অবশ্যই বেশি। কিন্তু দেশ হোক বা রাজ্য, কোনও শাসকই খুব দায়িত্বশীল— এমন ‘অভিযোগ’ নেই।

ঢের হয়েছে গঙ্গাযাত্রা আবার ফিরলাম পৃথিবীতে

সরল বিশ্বাস

গঙ্গার তলা নিয়ে মেট্রো চলবে! শুনে আসছি তো বহুদিন ধরে। কিন্তু সত্যিই সেই মেট্রোয় চড়তে পারব তো! আমাদের সবকিছুতেই সেই আঠারো মাসে বছর। যেটা এক বছরে হতে পারত, তার কাজ শেষ হতে হতে বারো-তের বছর লেগে যায়। কী জানি, গঙ্গার তলা দিয়ে মেট্রো চলার আগেই হয়তো কোথাও একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। হয়তো আবার বিশ বাঁও জলে চলে যাবে। এমন আশঙ্কা যে তাড়া করত না, তা নয়।

অবশেষে ভোটের আগে চালু হয়েই গেল। ইচ্ছে ছিল, প্রথমদিনেই সেই মেট্রো যাত্রার শরিক হব। এমন অনেক সিনেমাভক্তকে জানি, যাঁরা এখনও সেই 'ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শো' দেখার জন্যই মুখিয়ে থাকেন। তাঁদের কাছে একটা দিন পেরিয়ে যাওয়া মানেই মহাভারত অনেকটাই অশুদ্ধ হয়ে যাওয়া। আমার অবশ্য তেমন তাগিদ নেই। তবে ভাল সিনেমা দেখতে দেরি হলে মনটা কেমন খচখচ করে। তেমনই যখন

শিয়ালদা–সেক্টর ফাইভ মেট্রো চালু হল, কবে চাপব, কবে চাপব — এমন একটা ছটফটানি তাড়া করেছে।

তাই এবারও ইচ্ছে ছিল, যত দ্রুত সম্ভব, সেই মেট্রোয় চাপব। অবশেষে সেই ইচ্ছেপূরণ হল। গিয়েছিলাম হাওড়ায়। কয়েকজন নিকট আত্মীয়কে ট্রেনে তুলতে। ফেরার সময় মনে হল, এবার মেট্রো সফর করাই যায়। এই ট্রেন যে জলের বুক চিরে যাবে না, দু পাশে মাছ কিলবিল করবে না, এটা আগেই জানতাম। তবু গঙ্গার তলা দিয়ে যাচ্ছি। ভাবতে গেলেই একটা রোমাঞ্চ কাজ করে।

শুরুতেই বিস্তর বোকা বনে গেলাম। স্টেশনের বাইরে গিয়ে একে–তাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলাম, মেট্রো স্টেশনটা কোনদিকে। একেকজন একেক রকম উত্তর দিলেন। কেউ হাত দেখিয়ে দিলেন নতুন প্ল্যাটফর্মের দিকে। কেউ ফেরিঘাটের দিকে। পরে একজন বললেন, ওটা স্টেশনের ভেতরে। কাকে ছেড়ে কার কথা যে বিশ্বাস করি! কয়েকজন আরপিএফ জওয়ানকে জিজ্ঞেস করা যাক। তাঁরা নিশ্চয় জানবেন। অবশেষে বুঝলাম, সত্যিই স্টেশনের ভেতর। চোদ্দ নম্বর প্ল্যাটফর্মের কাছে।

মনে পড়ে গেল ‘আশিতে আসিও না’য় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই সংলাপটা, ‘আমি এখন জল পুলিশের আন্ডারে।’ মানে মেট্রোয় উঠতে গেলে প্ল্যাটফর্ম টিকিট কাটতে হবে। নইলে, টিটিকে কী করে বোঝাব যে আমি মেট্রোয় চড়তে চাই। আমি অবশ্য সদ্য স্টেশন থেকে বেরিয়েছি। ফলে, পকেটে প্ল্যাটফর্ম টিকিট ছিল। আর তার মেয়াদও ফুরোয়নি। কিন্তু যাঁরা শুধু মেট্রোয় আসবেন! বা যাঁরা মেট্রোয় এসে ট্রেন ধরবেন ভাবছেন, তাঁরা টিকিট কাটবেন কোথায়? মেট্রো থেকে বেরোলেই তো টিটি খপাত করে ধরবে। বলবে, টিকিট কই? এ তো মহাঝামেলা!

যাক, সেই ঝামেলা এড়িয়ে অবশেষে চোদ্দ নম্বরের কাছে গিয়ে একে–তাকে জিজ্ঞেস করে পাতালপ্রবেশ হল। টিকিট কাউন্টার খুঁজে পেতেও তেমন বেগ পেতে হল না। টিকিট কেটে আরেকপ্রস্থ পাতাল প্রবেশ। কোনদিকে ট্রেন আসবে। হাওড়া ময়দানটাই বা কোনদিকে, আর এসপ্ল্যানেড কোনদিকে, গুলিয়ে যাওয়ারই কথা। একটা ট্রেন এসে থামল। হুড়মুড়িয়ে সবাই চেপে গেল। সেই তালিকায় এই অধমও ছিল।

ও হরি। এই ট্রেন তো ধর্মতলা যাবে বলে মনে হচ্ছে না। সবাই নামার জন্য তোড়জোড় করছে। তার মানে এত লোক মহাকরণে নামবে! তাও আবার এই যাই

যাই বিকেলে! গতিক ভাল মনে হল না। একজনকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, এটা নাকি হাওড়া ময়দান। তার মানে ভুল ট্রেনে উঠে পড়েছি! তার মানে, আমার মতো বাকিরাও ভুল ট্রেনেই হুড়মুড়িয়ে উঠে পড়ল! আমি না হয় ভুলটা বুঝতে পারলাম। বাকিরা তো না বুঝে এই হাওড়া ময়দানে এসে ধর্মতলা খুঁজবে।

একজন বলল, নেমে গিয়ে নতুন করে টিকিট কেটে আবার উঠুন। নামতে আপত্তি নেই। আবার টিকিট কাটতেও আপত্তি নেই। কিন্তু আবার টিকিট কেটে ফিরে আসার আগেই তো এই ট্রেন ছেড়ে দেবে। তার মানে আরও আধঘণ্টার অপেক্ষা। এ তো মহা ঝামেলার ব্যাপার। অমনি ট্রেন এসে থামল হাওড়া ময়দানে। ট্রেন থামতে না থামতেই হুড়মুড়িয়ে ফের লোক উঠতে লাগল। যারা নামছে, তাদের নামতে গিয়ে বেশ বেগ পেতে হল। সব দরজা থেকেই প্রায় এক কোরাস, 'আরে আগে নামতে দিন। তারপর তো উঠবেন।' কে শোনে কার কথা। এ বিপুল জলতরঙ্গ রুধিবে কে?

অতএব, আমারও আর নামা হল না। মনে হল, এরা তো ধর্মতলাই যাচ্ছে। এদের ভিড়ে আমিও তো দিব্যি মিশে গেছি। নিশ্চয় আর নামার দরকার পড়বে না। আমার টিকিট তো ধর্মতলা পর্যন্তই। যথারীতি ট্রেন আবার এল হাওড়ায়। সেখানে পিলপিল করে আরেক রাউন্ড লোক উঠল। এবার নাকি গঙ্গার তলায় ঢুকবে। সবাই জানালার দিকে তাকিয়ে। তখনও কেউ ভাবছে, মাছ দেখবে। কেউ ভাবছে, হয়ত ডলফিন দেখবে। নিদেনপক্ষে গঙ্গার জল ঠেলে হয়তো যাবে। কোথায় বা কী? অন্ধকার

টানেলে একটা নীল আলো। তাকেই কেউ কেউ গঙ্গার জল ভেবে নিল। কেউ কেউ পেন্নাম ঠুকে দিল। কেউ পেছনে কাঁচের দরজা রেখে সেলফি তুলতে শুরু করে দিল। কারও কারও আবার নেটওয়ার্ক নেই দেখে মুখ ব্যাজার। এরইমাঝে ধ্বনিত হল সেই কণ্ঠস্বর, 'আপনি চলেছেন হুগলি নদীর তিরিশ ফুট নীচ দিয়ে। আপনার ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে নদী। ভারতে আর কোথাও এভাবে নদীর তলা দিয়ে মেট্রো যায় না। এই ঐতিহাসিক যাত্রা উপভোগ করুন।' ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনিতে গিরিশ পার্ক বা ভবানীপুরেরের তলা দিয়ে যাওয়ার যা অনুভূতি, এখানেও তাই। তবু মনে মনে গঙ্গার তলা দিয়ে যাচ্ছি ভেবে না হয় একটু রোমাঞ্চ আনা গেল।

প্রথমে মহাকরণ, তারপর এল এসপ্লানেড (ধর্মতলা)। নামতে যাব, অমনি আবার সেই রেকর্ডে বাজানো কণ্ঠস্বর। আপনি এখন হুগলি নদীর তলা দিয়ে। ...ওরে নদী পেরিয়ে কোন কাল চলে এসেছি। উঠলেই ধর্মতলার জনসমুদ্র। সেখানে কিনা নদীর তলা দিয়ে যাচ্ছি, এমন অনুভূতি আনতে হবে! বুঝলাম, রেকর্ড সেট করা আছে। কিন্তু কখন বাজবে আর কখন বাজবে না, এই সেটিংটা এখনও ঠিকঠাক হয়নি।

এবার বাইরে যাওয়ার পালা। কিন্তু এখানেও বিভ্রান্তি কম নয়। তীরচিহ্ন দিয়ে কোথাও লেখা আছে ব্লু লাইন, কোথাও আবার গ্রিন লাইন। এ দুটোর মানে কী, বোঝা মুশকিল। কাকে যে জিজ্ঞেস করি! এসব ক্ষেত্রে বেশি বুদ্ধি অ্যাপ্লাই না করাই ভাল। সবাই যেদিকে যাচ্ছে, সেদিকে হাঁটো। তাই হাঁটলাম। হেঁটেই চলেছি। কিন্তু এবার একদল দেখছি বাঁদিকে যাচ্ছে। একদল ডানদিকে। অনেক পরে বুঝলাম, যারা বাঁদিকে যাচ্ছে, তারা আরেকদফা পাতাল প্রবেশ করছে। অর্থাৎ, কেউ যাবে দমদমের দিকে। কেউ যাবে টালিগঞ্জের দিকে। অর্থাৎ, এক যাত্রায় এদের তৃষ্ণা মেটেনি। আমি বাপু এসবে নেই। আমি পাতাল থেকে মাটিতে উঠতে চাই।

বুঝলাম, আমার পথ অন্যদিকে। কিন্তু সামনে না পেছনে? কোনটা ময়দান মার্কেটের দিকে যাচ্ছে, কোনটা মেট্রো সিনেমার দিকে যাচ্ছে, কে জানে। তীরচিহ্ন দিয়ে এটা-সেটা আঁকা আছে ঠিকই, কিন্তু গোলকধাঁধার নানা পাক খেয়ে যখন কিছুই আর মাথায় ঢুকছে না। ছেড়ে দে মা, একটু আকাশ দেশি। অবশেষে যেন সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এলাম। 'মাটির পৃথিবী পানে আঁখি মেলি যবে/ দেখি সেথা বিপুল জনতা চলে/ নানা পথে, নানা দলে দলে।'

গঙ্গার তলা দিয়ে আসার রোমাঞ্চ তখন অনেক পেছনে। যাক, ভালোয় ভালোয় পাতাল থেকে কল্লোলিনী তিলোত্তমাকে খুঁজে পেয়েছি, এই ঢের।

মহানগরীর কোলাহল আমি দেখিয়াছি। গঙ্গার তলায় যাইতে চাই না আর।

পলাশ দেখতে নয়, শীতের সময় আসুন

বিপ্লব মিশ্র

শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা। সেই কোনকাল আগে লিখেছিলেন কবি ভাস্কর চক্রবর্তী। এখন শীত কখন যে আসে, আর কখন যে ফুরিয়ে যায়, বোঝাও যায় না। শরৎ, হেমন্ত এসব ঋতুগুলো ঋতুচক্র থেকে কবেই বিদায় নিয়েছে। এখন দিন পনেরো বর্ষাকাল। দিন পনেরো শীতকাল। বাকি এগারোমাস মোটামুটি গরম কাল। শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও একবার ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখুন, শীতের মেয়াদ সত্যিই মেরেকেটে পনের-কুড়ি দিন।

মোটামুটি ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকেই গরম পড়া শুরু হয়ে যায়। এখন ফেসবুকের কল্যাণে বেড়ানোর হরেকরকম গ্রুপ। এই মুহূর্তে কেউ দার্জিলিংয়ের ছবি পোস্ট করছে, তো পরমুহূর্তেই অন্য কেউ পোস্ট করছে পুরুলিয়ার ছবি। এখন তো আবার পলাশের সময়। গাছে গাছে লাল

পলাশ ধরে আছে। রাস্তায় সেই পলাশ পড়ে আছে। দৃশ্যগুলো দেখলেই মনে হয়, চলে যাই সেই পলাশের দেশে।

হোলির ঠিক আগে যেন বাঁকুড়া–পুরুলিয়ায় যাওয়ার ধুম লেগে যায়। ট্রেনে টিকিট পাওয়া যায় না। হোটেলে ঘর পাওয়া যায় না। সব নাকি অনেক আগে থেকেই বুকড। সবার ধারণা, এই সময়টায় নাকি বাঁকুড়া বা পুরুলিয়া যাওয়ার আদর্শ সময়। কিন্তু যাঁরা গেছেন, তাঁরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন।

বড়ন্তির ড্যাম ছবিতে দেখতে সত্যিই দারুণ লাগে। যেমন লাগে মুকুট মণিপুর বা জঙ্গল মহল। কিন্তু সকাল আটটার পর থেকে আর বাইরে থাকতে পারবেন না। ভোরবেলায় একবার বেড়িয়ে এলেন। ছবি তুললেন। এই পর্যন্ত ঠিক আছে। তারপর সারাদিন আপনাকে কার্যত হোটেলেই কাটাতে হবে। বেরোলেই গায়ে ছ্যাঁকা লেগে যাবে। মোটামুটি বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত গৃহবন্দিই থাকুন। বিকেল দিকে একটু হাওয়া দিলে হয়ত একটু ঘুরতে পারবেন।

আসলে, বাঁকুড়া–পুরুলিয়ার পর্যটন ব্যবসা দাঁড়িয়ে থাকে মোটামুটি নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারির ওপর। এই তিন মাসই মোটামুটি ঘোরা যায়। কিন্তু এই তিন মাসে বাঙালি বাঁকুড়া–পুরুলিয়ার নাম করবে না। তখন তাঁরা যাবেন দূরদূরান্তে। কেউ কাশ্মীর তো কেউ রাজস্থান। কেউ দক্ষিণে তো কেউ উত্তরে। ঠিক গরম পড়ার পরই বাঁকুড়া–পুরুলিয়ার কথা মনে পড়ে। যেন, এই সময় ছাড়া আর যাওয়া যায় না। যেন পলাশ ছাড়া আর কোনও সৌন্দর্য নেই।

এই দুটি জেলাই অনেক প্রাচীন। অনেক সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে। লোক সংস্কৃতি আছে। পাহাড় আছে, জঙ্গল আছে, নদী আছে। প্রাচীন সব মন্দির ও জনপদ আছে। অনেক গুণী মানুষের জন্ম এই দুই জেলায়। তাই এই দুই জেলায় আসতে হলে শীতে আসুন। ভাল করে ঘুরুন। শখ করে পলাশ দেখতে এসে গরমে এসি হোটেলবন্দি থাকার চেয়ে শীতের রোদ গায়ে মেখে হেঁটে বেড়ান। প্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ নিন।

দোহাই, পলাশ পলাশ করে নেচে উঠবেন না। মার্চ এপ্রিল মোটেই এই রুক্ষ মাটির দেশে আসার সময় নয়। আসতে হলে শীতে আসুন। তবেই এই দুই রত্নগর্ভা জেলাকে চিনতে পারবেন।

জোট নিয়ে এত জট কেন?

স্বরূপ গোস্বামী

বিজেপির একদফা প্রার্থীঘোষণা হয়ে গেছে ভোটঘোষণার অনেক আগে। সেইসব প্রার্থীরা অনেক আগে থেকেই নেমে পড়েছেন প্রচারে। অনেকের নাম হয়তো সরকারিভাবে ঘোষণা হয়নি, কিন্তু তাঁরাও জেনে গেছেন, প্রার্থী হচ্ছেন। ফলে মাঠে নেমে পড়েছেন। ব্রিগেড সমাবেশ থেকে তৃণমূলও একসঙ্গে ৪২ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে দিয়েছে। সেইদিন থেকেই সবাই নেমেও পড়েছেন। স্থানীয় জট, মান অভিমান, ক্ষোভ-বিক্ষোভ দু তিনদিন কাগজে শিরোনাম হয়েছে। কিন্তু দু'তিন দিনে ড্যামেজ কন্ট্রোলও হয়ে গেছে। বেসুরো লোকেরা দিব্যি 'মিলে সুর মেরা তুমহারা' গাইতে শুরু করে দিয়েছেন। কিন্তু এখনও বিস্তর জট থেকে গেছে তৃতীয় শক্তির জোটকে ঘিরে। তৃতীয় শক্তি বলতে বাম, কংগ্রেস, আইএসএফ।

তৃণমূলের সঙ্গে যে বামেদের জোট হচ্ছে না, তা অনেক আগে থেকেই পরিষ্কার। কংগ্রেসের সঙ্গেও যে তৃণমূলের জোট হবে

না, এই চিত্রটা মাস দেড়েক আগে ঠিক হয়ে গেছে। বাম, কং, আইএসএফ–কে মিলিতভাবে লড়তে হবে, এটাই চরম বাস্তবতা। তারপরেও মাসের পর মাস এত গড়িমসি কেন?

তিন শিবিরকে দেখলে মনে হবে, এঁরা বোধ হয় কেউ কাউকে চেনেন না। কেউ কোনওদিন কাউকে চোখেও দেখেননি। কারও সঙ্গে কারও কোনওদিন কথাই হয়নি। এমন ছত্রভঙ্গ অবস্থা নিয়ে আপনারা জোটে যাবেন? সেই জোটকে মানুষ কেন বিশ্বাস করবে?

কংগ্রেসের দিল্লি নেতৃত্বের কারও কারও তৃণমূল সম্পর্কে দুর্বল মনোভাব ছিল। তাঁরা নানা কারণে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চেয়েছেন। সেটা তাঁদের বাধ্যবাধকতা। অন্তত অধীর চৌধুরি যে তৃণমূলের সঙ্গে জোট চাননি, এটা তো পরিষ্কার। এখনও তিনিই দলের রাজ্য সভাপতি, এটাও পরিষ্কার। তাহলে, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা অনেক আগে থেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া গেল না কেন? বাম নেতৃত্ব বলতেই পারেন, কথা হয়নি, কে বলেছে? হয়তো খাপছাড়াভাবে হয়েছে। কিন্তু এত দিন পেরিয়ে যাওয়ার পরেও সমন্বয়ের এত অভাব কেন?

বড় শরিক হিসেবে বড় দায় অবশ্যই সিপিএমের। প্রথমে শরিকদের সঙ্গে বসা, তাঁদের বোঝানো। পরে কংগ্রেসের সঙ্গে বসা। তারপর আইএসএফের সঙ্গে বসা। সবথেকে বেশি আত্মত্যাগ অবশ্যই সিপিএমকেই করতে হয়েছে। করতে হবেও। সংসারে বড় দাদার ভূমিকা যে অনেক বেশি। ধরা যাক, আইএসএফের কথা। তারা নতুন দল। তেমন সাংগঠনিক কাঠামো হয়তো তৈরি হয়নি। তারা বামফ্রন্টের অংশও নয়। ফলে, ফরওয়ার্ড ব্লক, আরএসপি বা সিপিআইয়ের সঙ্গে যেভাবে কথা হয়, নিয়মিত বৈঠক হয়, আইএসএফের সঙ্গে সেই সিস্টেমে কথা হওয়া সম্ভবও নয়।

প্রায় মাস ছয়েক আগে থেকেই নৌশাদ সিদ্দিকি ঘোষণা করেছেন, তিনি ডায়মন্ড হারবার থেকে লড়াই করবেন। এভাবে একতরফা ঘোষণা করা যায় কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকতেই পারে। কিন্তু তিনি যে মোটামুটি একটা লড়াই দিতে পারবেন, এটা ঘটনা। তিনি যে এত প্রলোভন, এত হুমকির মুখেও বিকিয়ে যাননি, গুটিয়ে যাননি, এটাও ঘটনা। তিনি যে জোটের একমাত্র বিধায়ক, এটাও ঘটনা। গত তিন বছরে তিনি যে একটা বিশ্বাসযোগ্য মুখ হয়ে উঠেছেন, এটাকে

অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই। এইদিক গুলো মাথায় রেখে তাঁর আরও একটু সম্মান কি প্রাপ্য ছিল না? তাঁর সঙ্গে বা তাঁর দলের সঙ্গে কি আরও একটু ধৈর্য নিয়ে কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়া যেত না? অনেক দেরিতে বিকাশ ভট্টাচার্যের মতো মানুষকে কাজে লাগানো হল। এটা কি তিন-চার মাস আগে থেকে করা যেত না? তাহলে, এতখানি জট তৈরি হত না।

কংগ্রেস যত আসন চাইবে, হয়তো সংগঠনের নিরিখে এত আসন তাদের প্রাপ্য নয়। কং নেতৃত্বও সেটা জানেন না, এমন নয়। কিন্তু তাঁদেরও নানা বাধ্যবাধকতা থাকে। কর্মীদের, জেলার নেতাদের বোঝাতে হয় যে, আমরা অনেক বেশি আসন দাবি করেছি। দক্ষিণপন্থী দলে এটুকু গ্যালারি শো থাকাটাই স্বাভাবিক। আলাপ-আলোচনায় জট অনেকটাই কাটতে পারত। ভুল বোঝাবুঝি অনেকটাই দূর হতে পারত। কিন্তু তিন শিবিরের সাংবাদিক বৈঠক শুনুন। একে অন্যের ঘাড়ে দায় ঠেলতেই ব্যস্ত। শুনলেই মনে হবে, এদের জোট করার কোনও ইচ্ছেই নেই। নেহাত দায়ে পড়ে করতে হচ্ছে।

আচ্ছা, বাম, কংগ্রেস, আইএসএফ মিলিতভাবে কটা আসন পেতে পারে? এক বা দুই। যত বড়ই আশাবাদী হোন, চোখে দূরবিন লাগিয়েও এই মুহূর্তে সংখ্যাটা পাঁচের বেশি ধরা যাবে? হয়তো অনেকটা বেশিই দেওয়া হয়ে গেল। আপনি চান বা না চান, বাইনারি ঠিক হয়ে গেছে। মিডিয়াকে দোষারোপ করা ছাড়া এই বাইনারি ভাঙার জন্য তিন দল কী করেছে? প্রায় সব আসনেই লড়াই হবে তৃণমূল বনাম বিজেপি। চার-পাঁচটি আসন ছাড়া দ্বিতীয় হওয়ারও সুযোগ নেই। অর্থাৎ, যেখানে অন্তত নব্বই শতাংশ আসনে জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়াটাই অনিবার্য ভবিতব্য, সেখানেই এতখানি ঝগড়াঝাটি। তাহলে জেতার সম্ভাবনা থাকলে কী হত? মানুষের কাছে কোন ছবিটা তুলে ধরছেন? তৃণমূল বা বিজেপিকে অবিশ্বাস করার হাজারটা কারণ আছে। কিন্তু জোটের প্রতি বিশ্বাস থাকবে, তার কিছু ইতিবাচক কারণও থাকুক। যাঁরা নিজেরা নিজেদের বিশ্বাস করে না, যাঁরা একে অন্যের মুখ দেখে না, তাঁদের ওপর মানুষ আস্থা রাখবেন কী করে?

মাঝেমাঝেই শোনা যায়, তৃণমূল ও বিজেপি বিরোধী মানুষদের একজোট করতে হবে। আরে বাবা, সে তো অনেকদূরের ভাবনা। আগে তো নিজেদের একজোট হতে হবে। নিজেরা একজোট হতে পারছেন না। একসঙ্গে হাঁটতে পারছেন না। মানুষকে একজোট করবেন? ভাবলেন কী করে? যদি ভেবেও থাকেন, বললেন কোন সাহসে?

ফাঁপা হুমকি নয়, কাজে করে দেখাক নির্বাচন কমিশন

প্রশান্ত বসু

ভোটের দিন কবে ঘোষণা হবে? অনেক আগে থেকেই এ নিয়ে জল্পনা চলছিল। কেউ কেউ ভেবেছিলেন, রাম মন্দির উদ্বোধনের পরই হয়তো ঘোষণা হয়ে যাবে। কিন্তু মার্চ গড়িয়ে গেল। বোঝা গেল, তখনও হাত থেকে আরেকটা তাস ফেলা বাকি। রাম মন্দিরের হাওয়া থিথিয়ে গেছে। বাজারে নতুন কিছু ছাড়া দরকার। অতএব সিএএ। ভোটের মুখে বাজার গরম করার, আলোচনাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার আরেক মোক্ষম দাওয়াই।

নির্বাচন কমিশন কবে দিন ঘোষণা করবে, তার অপেক্ষায় বসে না থেকে অনেক দলই আগাম প্রার্থী ঘোষণা করে দিল। বিজেপি প্রথম দফায় দুশো জনের নাম জানিয়ে দিল। যে তালিকায় এই রাজ্যের কুড়ি। আবার তৃণমূল তো ব্রিগেড থেকেই বিয়াল্লিশ প্রার্থীকে র‍্যাম্পে হাঁটিয়ে দিল।

কিন্তু ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর দেখা গেল, ৮৩ দিন ধরে ভোট পর্ব চলবে। এমনিতেই অনেক আগে দামামা বেজে গেছে। ভোটের ফল বেরোনো পর্যন্ত কাদা ছোড়াছুড়ি চলবে। এমনকী সরকার গঠনের পরেও বেশ কিছুদিন ভোটের রেশ থাকবে। মোদ্দা কথা হল, অন্তত চার মাস দেশে উন্নয়নের কাজ কার্যত স্তব্ধ হয়ে থাকবে। এত বড় একটা দেশ, প্রায় দেড়শো কোটি মানুষ। সেই দেশ চারমাস কার্যত স্তব্ধ হয়ে থাকবে? উন্নয়নের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না!

এই রাজ্যে সাত দফা। মানছি, এই রাজ্যে যে হারে হিংসা আর জবরদখলের রাজত্ব চলছে, তাতে কোনওভাবেই এক দফা বা দু'দফায় সম্ভব নয়। তাই বলে সাত দফা! এতে সমস্যা আরও বাড়বে না তো? নির্বাচন কমিশনের কর্তারা বিভিন্ন দল ও জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করে সূচি তৈরি করেছেন। কোথা থেকে কোথায় বাহিনি পাঠানো সুবিধা, সেগুলো হয়তো আলোচনায় উঠে এসেছে। কিন্তু সাদা চোখে কতগুলো বিষয় দেখা যায়। যেগুলো হয়তো নির্বাচন কমিশনের নজর এড়িয়ে গেছে।

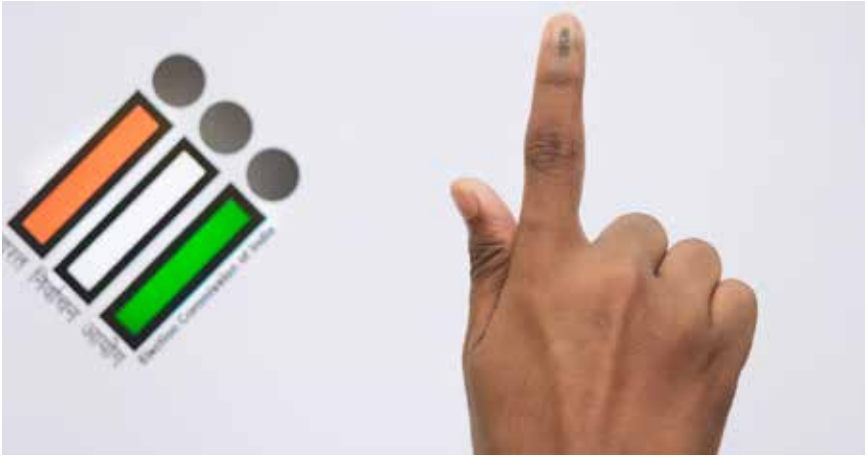

ভোটে সবথেকে বেশি হিংসার আশঙ্কা কোথায়? কলকাতা ও দুই ২৪ পরগনা। অথচ, অন্যান্যবারের মতোই এইসব এলাকায় ভোট সবার শেষে। অর্থাৎ, এইসব এলাকায় উত্তেজনা অকারণে দেড় মাস জিইয়ে রাখা হল। শুরুতে যদি বাহিনি দিয়ে কলকাতা ও লাগোয়া অঞ্চলের ভোট করিয়ে নেওয়া যেত, উত্তেজনা অনেকটাই প্রশমিত হয়ে যেত। তারপর ধীরেসুস্থে দক্ষিণ বঙ্গে বা উত্তরবঙ্গে ভোট হতে পারত।

নির্বাচন কমিশন প্রতিবারই হুঙ্কার ঝাড়ে, কোনও হিংসা বরদাস্ত করা হবে না। ইত্যাদি ইত্যাদি। বাস্তবে দেখা যায়, সবই ফাঁকা আওয়াজ। দু একজন পুলিশ কর্তাকে লোকদেখানো সরানো হয়। লোকে ভাবে, কমিশন বুঝি দারুণ কড়া। অথচ, ভোটের দিন বাহিনির দেখাই পাওয়া যায় না। জেলা প্রশাসন ইচ্ছমতো তাদের ব্যবহার করে। কোথাও কোথাও বসিয়ে রাখে। কারণ, জেলা প্রশাসনের কর্তারা ভাল করেই জেনে গেছেন, এই কমিশনের দৌড় কতদূর। তাঁরা ভাল করেই জানেন, কমিশন বড়জোর কয়েকদিন দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেবে। ভোট চুকলেই তাঁরা আবার স্বপদে বহাল হয়ে যাবেন। এত হিংসাত্মক ভাষণ, এত অনিয়ম, নির্বাচন কমিশন কজনের প্রার্থীপদ বাতিল করতে পেরেছে? এমনকী কোন কোন বুথে ঝামেলা হতে পারে, তার নির্দিষ্ট তালিকা আগাম জমা দেওয়ার পরেও সেইসব বুথে কোনও বাহিনি দেওয়া হয়নি। অবাধে ছাপ্পা হয়েছে। এমনকী, সকাল দশটাতেই সব ভোট পড়ে গেছে।

তাই কমিশন বরং হুঙ্কার না ঝেড়ে কিছুটা হলেও নিজেদের কাজ করে দেখাক। সিবিআই, ইডি নামের দুই রাষ্ট্রযন্ত্র যেমন অপদার্থতার চূড়ান্ত নিদর্শন দেখিয়ে যাচ্ছে, নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকেও খুব বেশি প্রত্যাশা না রাখাই ভাল। নির্বাচন কমিশন আগে অন্তত বিশ্বাসযোগ্যতার পাসমার্ক অর্জন করুক। তারপর না হয় হুমকি দেবে।

একটি দলবদল ও কয়েকটি মোক্ষম থাপ্পড়

রক্তিম মিত্র

কেউ এক দল থেকে অন্য দলে গেলে কয়েকটা চেনা সংলাপ ঘোরাফেরা করে। তৃণমূল থেকে যদি কেউ বিজেপি-তে যান, তিনি বলবেন, 'এই দুর্নীতি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। দম বন্ধ হয়ে আসছিল।'

আর যদি কেউ বাম বা বিজেপি বা কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে আসেন, তাহলে তিনি বলবেন, 'বিরোধী থেকে কাজ করতে পারছিলাম না। রাজ্যে যে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে, তাতে সামিল হলাম।'

ভোটের বাজনা বাজলেই এই আসা-যাওয়ার পর্বটা বেড়ে যায়। বানর যেমন এই ডাল থেকে ওই ডালে ঝাঁপ দেয়, এই দল থেকে ওই দলে ঝাঁপ দেওয়ার পর্বটাও সেইরকম।

এবার মুকুটমণি অধিকারী। এমনিতে খুব একটা পরিচিত নাম নয়। বিশেষ করে জেলার রাজনীতির খোঁজখবর যাঁরা রাখেন না, তাঁদের কাছে অনেকটাই অপরিচিত। তিনি রানাঘাট দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক। হঠাৎ করে দেখা গেল, তৃণমূলের মিছিলে হাঁটছেন। পরে তাঁর হাতে পতাকাও ধরিয়ে দেওয়া হল।

পাঁচ বছর আগের ছোট্ট একটা ঘটনা এই সুযোগে বলে নেওয়া যাক। ২০১৯-র লোকসভায় রানাঘাট থেকে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তখন ছিলেন সরকারি চিকিৎসক। ফলে, ভোটে দাঁড়াতে গেলে পদত্যাগ করতে হত। কিন্তু স্বাস্থ্যদপ্তর নানা টালবাহানা করে তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করল না। ফলে, সে যাত্রায় আর ভোটে দাঁড়ানো হল না। বিকল্প প্রার্থী হিসেবে জগন্নাথ সরকারের নাম ঘোষণা হল। জিতেও গেলেন। ২০২১-র বিধানসভার

আগে অবশ্য আগেভাগেই পদত্যাগ করেন। ফলে, দাঁড়াতে সমস্যা হয়নি। জিতে বিধায়কও হলেন।

চারদিন আগেও ছিলেন নরেন্দ্র মোদির সভায়। হঠাৎ তৃণমূলে কেন? আসলে, ভেবেছিলেন, বিজেপি থেকে লোকসভায় টিকিট পাবেন। কিন্তু প্রার্থী হিসেবে ফের ঘোষণা হল জগন্নাথ সরকারের নাম। অতএব গোঁসা হল। গোঁসা হলে প্রথমে যা হয়! বললেন, 'এই প্রার্থী দিয়ে ভোটে জেতা যাবে না।' কিন্তু ঘোষণা তো হয়ে গেছে। বদল হওয়ার সম্ভাবনাও কম। অতএব, শিবির বদল করো।

প্রার্থী হতে পারিনি, তাই তৃণমূলে এসেছি, এমনটা তো বলা যায় না। তাহলে! দলবদল করে সবাই যা বলে, তিনিও মোটামুটি সেই বাঁধা গতেই হাঁটলেন। 'নদিয়া জেলার উন্নয়ন হয়নি। বিধায়ক থেকে উন্নয়নের কাজ করতে পারছিলাম না। তাই শাসকদলে যোগ দিলাম।'

যাঁরা পরম আনন্দে অন্য দল থেকে ভাঙিয়ে এনে হাতে পতাকা ধরিয়ে দেন, তাঁরা ভেবেও দেখেন না, এই জাতীয় স্বীকারোক্তির মধ্যে কতখানি থাপ্পড় মেশানো আছে। একজন বিধায়ক বলছেন, নদিয়া জেলায় কোনও উন্নয়ন হয়নি। থাপ্পড়টা কার গালে লাগল? একজন বিরোধী বিধায়ক বলছেন, 'বিরোধী হয়ে কাজ করতে পারছিলাম না।' কাজ করতে বাধাটা কে দিচ্ছিল? একটা সরকারের পক্ষে এটা কতটা লজ্জার, এটুকু বোঝার মতো বোধবুদ্ধিটাও থাকে না।

অনেকে মুকুটমণিবাবুকে গালমন্দ করবেন। কেউ ধান্দাবাজ বলবেন। কেউ হয়তো পাল্টিবাজ বলবেন। কিন্তু শাসকদলের 'সেনাপতি'র পাশে দাঁড়িয়ে এতবড় সত্যিটা বলার জন্য তাঁর সাহসের তারিফ করবেন না? দলবদলের পুরস্কার কী হতে পারে? হতে পারে, রানাঘাটে তাঁর নামই তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা হল। অথবা, প্রার্থী করা হল না। কিন্তু শাসক দলে আসার সুবাদে প্রভাব অনেকটা বাড়বে। আগে থানার ওসি পাত্তা দিতেন না, এখন এসপি তাঁর কথা শুনে চলবেন।

১) যদি টিকিট পান, তাহলে কী বার্তা যাবে? বিরোধী থেকে শাসক দলে এলেই টিকিট পাওয়া যায়, এমন প্রত্যাশা যদি থেকে থাকে, তাহলে তৃণমূলকে তিনি কতখানি সস্তা দল মনে করেন, একটু ভেবে দেখুন।

২) একদলের নির্বাচিত বিধায়ক। অন্য দলে যোগ দিতে হলে তো পদত্যাগ করতে হয়। কদিন আগেই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাপস রায়। আগে পদত্যাগ করেছেন, তারপর বিজেপির পতাকা ধরেছেন। কিন্তু মুকুটমণিবাবু জানেন, তৃণমূলে যেতে গেলে এসব নৈতিকতা মানার কোনও দায় নেই। এটা আরেকটা সপাটে থাপ্পড়।

৩) যদি হয়তো টিকিট পেলেন না, বিধায়কই থেকে গেলেন। তিনি নিশ্চিত, তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে না। তিনি নিশ্চিত, বাংলার বিধানসভায় 'দলত্যাগ বিরোধী আইন'কে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলেছেন স্পিকার। তিনটে টার্ম মিলিয়ে অন্তত সত্তরজন বিধায়ক দলত্যাগ করে শাসক দলে এসেছেন। কিন্তু সদস্যপদ যায়নি। তাঁরও যাবে না। এটা কার গালে থাপ্পড়? ভারতে আর কোন রাজ্যের স্পিকারের প্রতি 'দলবদলু'রা এতখানি আস্থা রাখতে পারেন!

একটা ছোট্ট দলবদল। কতগুলো মোক্ষম থাপ্পড়ই না দিয়ে গেল!

ওপেন ফোরাম

অকথা-কুকথাকে এত গুরুত্ব কেন?

ভোটের দামামা আগেই বেজে গেছে। দিন ঘোষণার আগেই প্রার্থীর নাম ঘোষণা হয়ে গেছে। প্রচারও শুরু হয়ে গেছে। একটা সময় ছিল, যখন দেওয়াল লিখন ছিল এই প্রচারের বড় একটা হাতিয়ার। পাড়ায় পাড়ায় লেখা হত নানারকমের ছড়া। সেই ছড়ায় যেমন রঙ্গ রসিকতা থাকত, তেমনই কখনও কখনও তা হয়তো একটু মাত্রা ছাড়িয়ে যেত। আবার কোথাও হয়তো ছেলে ছোকরারা লিখে ফেলেছে। বড়দের ধমক খেয়ে পরে মুছেও ফেলতে হয়েছে।

কিন্তু হাতে হাতে স্মার্টফোন। এই আবহে দেওয়াল যেন অনেকটাই ফিকে। এখন মোবাইল বেয়ে আপনার হাতে দিনভর এসে চলেছে নানা রকমের পোস্ট। এটাই হাইটেক প্রচার। নির্বাচনী ভাষণ আগেও ছিল। তাতে একে অন্যকে দেখে নেওয়ার হুঙ্কার ছিল। এখন সেই হুঙ্কার এসে পৌঁছে যাচ্ছে আপনার বাড়িতে। টিভিতে সারাদিন সেই প্ররোচনা মূলক ভাষণের ক্লিপিং। এক দৃশ্য, এক সংলাপ সারা দিনে অন্তত তিনশোবার দেখানো হচ্ছে। সেটাকে কাউন্টার করে পাল্লা কোনও কুকথা বলা হলে সেটাকে ঘিরেও দিনভর প্রচার। অর্থাৎ, আপনি যদি রুচি ও শালীনতা মেনে প্রচার করেন, তাতে চ্যানেলের টিআরপি উঠবে না। নেতা নেত্রীরা যত কদর্য প্রচার করবেন, যত অকথা-কুকথার ফোয়ারা ছোটাবেন, আর আপনি-আমি যত রসিয়ে রসিয়ে তা উপভোগ করব, তত চড়চড় করে বাড়বে টিআরপি।

ভোটের সেই দেওয়ালের বদলে সোশ্যাল মিডিয়ার সেই দেওয়াল। আসলে ওয়াল। দিনভর যে যা পারছে, লিখে চলেছে। নানা বিকৃত রুচির পোস্ট, মিম তৈরি হয়েই চলেছে। কেউ কেউ যেমন বিক্ষিপ্তভাবে বলছেন, তেমনই সব দলেরই আছে সাইবার সেল। অর্থাৎ, ডিজিটাল লেঠেলবাহিনী। সংগঠিত উপায়েও সেখানেও অকথা-কুকথার ফোয়ারা চলছে। আপনি দেখতে না চাইলেও দেখতে হচ্ছে। শুনতে না চাইলেও শুনতে হচ্ছে।

কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, এই মাপকাঠিও মাঝে মাঝে গুলিয়ে যাচ্ছে। ভোট দিতে দেব না, প্রকাশ্যে কেউ কেউ এমন হুমকি দিচ্ছেন। টিভিতে, সোশ্যাল মিডিয়ায় দিনভর প্রচারও পাচ্ছেন। খুচরো নেতা থেকে আরও বড় মাপের নেতা হয়ে যাচ্ছেন। যাঁরা এই হুমকি দিচ্ছেন, তাঁরা বোধ হয় ভেবেই নিয়েছেন, প্রশাসন কিছু করবে না, নির্বাচন কমিশন কিছু করবে না, এমনকী নিজের দলও শাসন করবে না। উল্টে বাহবা দেবে।

প্রশ্ন হল, এই ভাষা সন্ত্রাসে কি লাগাম দেওয়া যায় না? প্রশাসন বা নির্বাচন কমিশনের যেমন দায়িত্ব আছে, তেমনই দায়িত্ব রয়েছে বিভিন্ন দল ও গণমাধ্যমেরও। এইসব অকথা-কুকথা যেন নতুন করে উৎসাহ না পায়, সেটা দেখাও দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। পাশাপাশি আমরা, অর্থাৎ আম নাগরিক। আমরা যে কেউ যে কোনও দলের সমর্থক হতে পারি। কিন্তু নিম্নরুচির প্রচারকে আমরাও উৎসাহিত করব না, বরং ধিক্কার দেব, এই মানসিকতা আমরাও যদি দেখাতে পারি, কুকথার স্রোত আপনিই থেমে যাবে।

বোর্ড কর্তাদের শাস্তি কে দেবে?

মুকুল বসু

এখনও একমাসও পেরোয়নি। হঠাৎই বোর্ডের চুক্তি থেকে বাদ পড়ে গেলেন ঈশান কিষাণ ও শ্রেয়স আয়ার। কারণ, তাঁরা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছিলেন। তার থেকেও বড় কারণ, তাঁরা রনজি ট্রফিতে খেলেননি।

আসলে, আইপিএল আসার পর থেকে ঘরোয়া ক্রিকেটকে উপেক্ষা করাটা যেন একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘরোয়া ক্রিকেটে খেললে স্টেটাস থাকে না। দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক মনে হয়। আর আইপিএলের সুবাদে এক-দু বছরেই

কেউ কেউ এতটাই বিত্তবান হয়ে পড়ছেন যে, ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন। ঘরোয়া ক্রিকেট তো বটেই, এমনকী দেশের হয়ে খেলারও সময় নেই। অথচ, আইপিএলের শিবিরে ঠিক সময়মতো পৌঁছে যাচ্ছেন। ক্রিকেটাররা ভুলেই যাচ্ছেন, আইপিএলের সুবাদে আজ হয়তো তাঁরা তারকা, কিন্তু তাঁদের উত্থান সেই ঘরোয়া ক্রিকেট থেকেই। কেউ অনূর্ধ্ব ১৯ পর্যায়ে বা ভারত ‘এ’ দলের হয়ে সাফল্য পেয়েছেন বলেই আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো নিলামে ওই দর হেঁকেছে। নইলে, কে চিনত এই তারকাদের!

সেদিক থেকে বোর্ডকে কড়া পদক্ষেপ নিতেই হত। বাংলায় একটা কথা চালু আছে। ঝিকে মেরে বউকে শিক্ষা দেওয়া। ঈশান বা শ্রেয়সকে শাস্তি দেওয়া হলেও তাঁরা নিছকই উপলক্ষ। আসলে, আরও বড় তারকাদের হয়তো একটা বার্তা দেওয়া হল। সত্যিই তো, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা বা হার্দিক পান্ডিয়ারা কবে শেষ রনজি ম্যাচে খেলেছেন, নিজেরাও বোধ হয় ভুলে গেছেন। অথচ, একসময় গাভাসকার, কপিলদেব, বেঙ্গসরকার, রবি শাস্ত্রীদের মতো তারকারা নিয়মিত রনজি ট্রফিতে খেলেছেন।

বোর্ড কড়া বার্তা দিতে চাইল, এটা হল মুদ্রার একটা দিক। অন্য একটা দিকও আছে। যেমন, কয়েকদিন আগেই ওয়াংখেড়েতে হয়ে গেল রনজি ট্রফির ফাইনাল। বিদর্ভকে হারিয়ে ৪২ বার রনজি জিতল মুম্বই। কিন্তু এই ফাইনালকে ঘিরে কোনও উন্মাদনাই নেই। গ্যালারি একেবারেই শুনশান। আইপিএলের উদ্বোধন বা ফাইনালের দিন বোর্ড কর্তাদের ঢল নেমে যায়। পরিবার নিয়ে সবাই হাজির হয়ে যান। বিভিন্ন রাজ্য সংস্থার কর্তারাও গিয়ে ভিড় করেন। সেই উপলক্ষে বোর্ডের মিটিং বসে যায়। নির্বাচকরাও দিব্যি হাজির হয়ে যান। অথচ, এই রনজি ফাইনালে মাঝে একদিন হাতে গোনা কয়েকজন প্রাক্তন ক্রিকেটারকে দেখা গেল। না শুরুর দিন, না শেষের দিন, বোর্ডের কোনও শীর্ষ কর্তাকেই দেখা গেল না। বোর্ড সভাপতি রজার বিনি বা বোর্ড সচিব জয় শাহর কোনও পাত্তা নেই। এমনকী, কজন নির্বাচক ছিলেন, তা নিয়েও প্রশ্ন।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, যে বোর্ডকর্তারা ঘরোয়া ক্রিকেটের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চান বলে দাবি করছেন, তাঁরা নিজেরা ঘরোয়া ক্রিকেটকে কতখানি গুরুত্ব দিচ্ছেন? রনজি ফাইনালের মতো আসরে তাঁরা নিজেরা গরহাজির কেন? ক্রিকেটারদের না হয় শাস্তি হল। কিন্তু এই বোর্ড কর্তাদের শাস্তি কে দেবে?

অজয় নন্দী

অনেক টিকি ওই টিকিটেই বাঁধা

ইডেনে খেলা এলেই সিএবি কর্তাদের ব্যস্ততা বেড়ে যায়। কত টিকিট তোলা যায়। কত টিকিট কাকে কাকে দেওয়া যায়। তিনি টিকিট দিতে পারেন, এটাই তাঁর ইউএসপি। এটাকে ভাঙিয়েই সারা বছর চলতে হয়। এই অঙ্কের কাছে বাকি সব অঙ্কই যেন নিতান্ত তুচ্ছ। রনজিতে বাংলা কেন এভাবে হারল, ক্লাব ক্রিকেটে কেন এমন অবস্থা, তা নিয়ে সময় ব্যয় করতে বয়েই গেছে।

এমন একটা নির্লজ্জ গড়াপেটার পর সিএবি কী করতে পারত? সদিচ্ছা থাকলে অনেককিছুই করা যেত। সিএবির সংবিধানেই সেই ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু যে কোনও তদন্তকে ধামাচাপা দেওয়ার সেরা উপায় হল, কোনও একটা কমিটি তৈরি করে দাও। হাতে একটা লম্বা সময় রাখো। কমিটির কোনও মিটিংও হবে না।

ব্যস, কদিন পর সবাই দিব্যি ভুলে যাবে। সিএবি ঠিক সেটাই করল।

অভিযোগ ছিল মহমেডান ও টাউন ক্লাবের ম্যাচকে ঘিরে। এমন চোখে আঙুল দেওয়া ভিডিও দেখার পর আর অভিযোগ বলি কী করে? একেবারে হাতেগরম প্রমাণ

বলতে যা বোঝায়, তাই। যাঁরা সামান্যতম ক্রিকেট খেলেছেন বা ক্রিকেট সম্পর্কে যাঁদের সামান্যতম আগ্রহও আছে, তাঁরা একঝলক দেখেই বুঝতে পারবেন কোন স্তরের নির্লজ্জ গড়াপেটা হয়েছে। তারপরেও সিএবি কর্তারা কী অদ্ভুতভাবে তাকে আড়াল করতে উঠেপড়ে লাগলেন!

এমন নির্লজ্জ গড়াপেটার তদন্তের জন্য কোনও কমিটি লাগে না। বরং ধামাচাপা দেওয়ার জন্যই কমিটি লাগে। বাংলা ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা ঠিক সেটাই করল। কখনও অমুক কমিটি দেখাল, কখনও অ্যাপেক্স কাউন্সিল দেখাল। ভাবতে অবাক লাগে, এই সিএবির মাথায় বসে আছেন স্নেহাশিস গাঙ্গুলির মতো ক্রিকেটার। নয়ের দশকে কর্ণাটকের বিরুদ্ধে রনজি ম্যাচে ভাঙা পা নিয়ে কী দুরন্ত, কী সাহসী ইনিংসটাই না খেলেছিলেন! যেন রূপকথার মতো। আজও যেন চোখের সামনে ভাসে। অথচ, চেয়ারে বসে সেই স্নেহাশিসের কী করুণ পরিণতি!

মানছি, ঘরোয়া লিগে এমন গড়াপেটা এই প্রথম নয়। কান পাতলে এমন অনেক ম্যাচের কথাই শোনা যায়। কিন্তু এই ম্যাচ যে সব লজ্জাকে ছাপিয়ে গেছে। এই ম্যাচের যে জলজ্যান্ত প্রমাণ রয়েছে। তারপরেও সিএবি কর্তা সেই ভিডিওতে নয়, কাগজে লিখে কে কী রিপোর্ট দিয়েছেন, তার ওপর ভরসা রাখার কথা বললেন। যাঁদের খেলোয়াড়েরা এমন নির্লজ্জভাবে ইচ্ছাকৃত আউট হলেন, সেই মহমেডান পর্যন্ত অস্বীকার করেনি। তারপরেও টাউনের এক প্রভাবশালী কর্তাকে রক্ষা করার এত কীসের তাগিদ?

বাংলা মিডিয়া একটা স্তর পর্যন্ত গেল। তারপর নানা অঙ্কে থেমে গেল। ইনি বলেন এই, তিনি বলেন ওই। এই আবর্তেই ঘুরপাক খেতে লাগল। সবথেকে বড় কথা, ভিনরাজ্যের কোনও খেলোয়াড়কে ক্লাব ক্রিকেটে খেলাতে বোর্ডের ছাড়পত্র লাগে না, এই সাধারণ নিয়মটুকুও সিএবি কর্তারা জানতেন না! এঁরা

এমন একটা নির্লজ্জ গড়াপেটার পর সিএবি কী করতে পারত? সদিচ্ছা থাকলে অনেককিছুই করা যেত। সিএবির সংবিধানেই সেই ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু যে কোনও তদন্তকে ধামাচাপা দেওয়ার সেরা উপায় হল, কোনও একটা কমিটি তৈরি করে দাও।

ক্লাব চালাচ্ছেন? এঁরা সিএবি চালাচ্ছেন?

এরপরেও হইচই হবে না। এতবড় একটা অপরাধকে লোকদেখানো ‘ভুল’ বলে দিব্যি পার পেয়ে যাবেন কর্তারা। কোনও প্রশ্ন উঠবে না। ওই যে, টিকিটে অনেক টিকি বাঁধা।

মোহন–সচিবের ফাঁপা হুমকিকে কে পাত্তা দেয়!

অজয় নন্দী

নিত্য নতুন বায়নায় মোহনবাগান সচিবের কোনও জুড়ি নেই। সেই বায়না কতটা হাস্যকর, সেদিকে কোনও ভ্রুক্ষেপই থাকে না। যেভাবেই হোক, খবরে থাকতে হবে। টিভিতে মুখ দেখাতে হবে। কাগজে নাম ছাপাতে হবে। তার জন্য মোহনবাগান হাস্যকর হল কিনা, এসব ভেবেও দেখেন না।

এক একটা চেয়ারের একেকটা ওজন আছে। অনেকেই সেই চেয়ারের মূল্য বোঝেন না। সেই চেয়ারের ওজন বোঝেন না। মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত তেমনই একজন প্রচারসর্বস্ব কর্তা। আগে যেমন সস্তা নাটক করতেন, এখনও সেই সস্তা নাটকই চালিয়ে যান। মাস খানেক আগেই তিনি হঠাৎ করে বলে বসলেন কলকাতা লিগে খেলব না। এমনকী মোহনবাগান নাকি ঝাড়খণ্ড বা ওড়িশার অনুমোদন নিয়ে খেলব। ভাগ্যিস বলেননি উয়েফার অধীনে খেলব।

এবার ডার্বির আগে হঠাৎ করে তিনি সমর্থকদের ডার্বি বয়কটের ডাক দিয়ে বসলেন। যেন নেতাজি দেশবাসীকে ডাক দিচ্ছেন। এমন একটা ইস্যু, যেটাকে আলোচনা করে সহজেই মিটিয়ে নেওয়া যেত। কিন্তু তিনি তো ভাঁড়ামোতে বিশ্বাসী। তিনি তো গায়ে গা পেড়ে ঝগড়ায় বিশ্বাসী। সহজ ব্যাপারটা যদি সহজে মিটে যায়, তাহলে যে তাঁর ঘোলাজলে মাছ ধরা হবে না। তাহলে যে তাঁর খবরে থাকা হবে না।

এমনিতেই এবারের ডার্বি নিয়ে অনেক জটিলতা তৈরি হয়েছিল। হঠাৎ করে রাজ্যের শাসক দল ব্রিগেড সমাবেশ ডেকে দেওয়ায় পুলিশ দেওয়া নিয়ে সমস্যা। যদি উল্টোটা হত! অর্থাৎ, আগে তৃণমূলের সমাবেশের তারিখ ঘোষণা হয়ে গেল। তারপর বড় ম্যাচ আয়োজন করতে গেলে পুলিশ অনুমতি দিত! নিশ্চয় বলা হত, ওইদিন শাসকদলের সভা আছে, তাই অনুমতি দেওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে পুলিশ বলতে পারত, ওই দিন ডার্বি আছে, তাই ব্রিগেড সভার অনুমতি দেওয়া যাবে না। তার বদলে হল উল্টোটা। শাসক দল হঠাৎ করে সভা ঘোষণা করল, সেই কারণে

অনেক আগে ঘোষিত ডার্বি নাকি করা যাবে না। দুই ক্লাবের কর্তারাই দন্ত বিগলিত করে মেনে নিলেন। একবারও বলতে পারলেন না, ডার্বির সূচি আগেই ঘোষিত, তাহলে সেটা পেছোবে কেন? এই যুক্তির কথা তুলে ধরলে বুঝতাম প্রতিবাদী। না, এতখানি মুরোদ মোহন সচিবের নেই।

তিনি বায়না ধরলেন ফালতু একটা বিষয় নিয়ে। ইস্টবেঙ্গলের টিকিট কেন কম দামের, আমাদের টিকিট কেন বেশি দামের? অতএব, আমরা টিকিট তুলব না। আমাদের সমর্থকরাও খেলা দেখবেন না। সমর্থকরে দেখবেন না দেখবেন না, সেই ব্যাপারে নিদান দেওয়ার তিনি কে? দেখা গেল, সমর্থকরা দিব্যি টিকিট তোলার জন্য লাইন দিয়েছেন। অর্থাৎ, জাতির উদ্দেশে তাঁর বার্তার কোনও প্রভাবই পড়ল না। তখন মুখ বাঁচাতে আসরে নামানো হল আরও এক প্রচারের কাঙাল ক্রীড়ামন্ত্রীকে। ডার্বি কোথায় হবে, তা নিয়ে এতদিন মুখ খোলার সাহস দেখাননি। পাছে দিদি ক্ষেপে যান! এখন যখন জট ছেড়েছে, সময় কিছুটা পিছিয়ে সেইদিনই ডার্বি আয়োজনের ব্যবস্থা হয়েছে, তখন তাঁকে প্রচারের ক্ষীর খেতে হবে। তিনি এবার নেমে পড়লেন ইস্টবেঙ্গলকে বোঝাতে। রফাসূত্র বেরোলো। কিন্তু নিট ফল তো একই থাকল।

এইসব প্রচারপ্রিয় মন্ত্রী আর কর্তারা না বোঝেন খেলা না বোঝেন সমর্থকদের আবেগ। যেনতেন প্রকারেণ তাঁদের প্রচারে থাকতে হবে। এখানে সেখানে মুখ বাড়িয়ে ছবি তুলতেই হবে।

মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে, মোহনবাগান সচিব দিনের পর দিন এই জাতীয় সস্তা নাটক আর ভাঁড়ামি করে যাচ্ছেন কীসের ভরসায়? আসলে, স্বভাব। বহুকালের পুরনো স্বভাব। খবরে থাকার জন্য একেবারে নীচুস্তরের ভাঁড়ামি করতেও এঁদের আটকায় না। কেউ ইচ্ছে করলে নিজে ভাঁড় হতেই পারেন। কিন্তু মোহনবাগান সচিবের চেয়ারে বসে যে এমন ভাঁড়ামি করা যায় না, এটা বলার মতো ক্লাবে কেউ নেই! পাশে পেয়েছেন আরেক ভাঁড়কে। যিনি শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রীর ভাই হওয়ার সুবাদে মোহনবাগানের মতো ক্লাবের ফুটবল সচিব হয়ে বসে আছেন। একসময় যে ফুটবল সচিব ছিলেন শৈলেন মান্না, এমনকী কয়েক বছর আগেও যে চেয়ারে বসতেন সত্যজিৎ চ্যাটার্জি, সেই চেয়ারে আজ বাবুন ব্যানার্জি। আসলে, এই বাবুন ব্যানার্জিদের ফুটবল সচিব না করলে দেবাশিসবাবুরা যে সচিব থাকবেন না।

দোষটা একা তাঁদের নয়। আসলে, মূলস্রোত মিডিয়াও বড় বেশি অসহায়। দন্ত বিগলিত করা রিপোর্টারকূলে ছেয়ে গেছে ময়দান। সচিবও হ্যাংলার মতো সেলফি তোলেন। রিপোর্টাররাও সমগোত্রীয়। সেই কারণেই প্রশ্ন ওঠে না। কেউ জানতে চায় না, রাজা তোর কাপড় কোথায়?

দশ বছর আগে, মহানায়ক অরূপ কুমারের সঙ্গে

সরল বিশ্বাস

বছর দশেক আগের কথা। সেবারও লোকসভা ভোটের আবহ। অফিস থেকে পাঠাল বাঁকুড়ায়। সেখানে ভোটের হাওয়া পরখ করতে।

বাঁকুড়ায় সেবার হেভিওয়েট লড়াই। একদিকে বাসুদেব আচারিয়া। তৃণমূলের প্রার্থী মুনমুন সেন। বিজেপির সুভাষ সরকার। বোঝাই যাচ্ছিল, বিজেপির ডাক্তারবাবু বেশ ভাল ভোট কাটবেন। বিরোধী ভোটে ভাগ বসাবেন। সেই অঙ্কে হয়তো জিতে যাবেন মুনমুন সেন।

কিন্তু গিয়ে বুঝলাম, মুনমুন সেন নামেই প্রার্থী। তিনি এলাকার কিছুই চেনেন না। তাঁর ভোট ম্যানেজার আসলে জেলা পরিষদের সভাপতি অরূপ চক্রবর্তী। মুনমুনের সঙ্গে তাঁর ছবির কাট আউটে বাঁকুড়া শহর ছেয়ে গেছে। নানা ভঙ্গিমায় পোজ দিয়ে তোলা ছবি। কোথাও তিনি সাদা জ্যাকেট পরে। কোথাও তিনি পাজামা-পাঞ্জাবি পরে। বোঝাই গেল, বেশ বর্ণময় চরিত্র।

মনে হল, লোকটা কে তো একটু কাল্টিভেট করতে হচ্ছে। মানে, এই লোকটার সঙ্গে কথা না বলে কলকাতা ফিরে যাওয়া ঠিক হবে না। কখনও গাড়ির ড্রাইভার, কখনও হোটেলের কর্মী, কখনও বিভিন্ন দোকানি। অনেকের মুখেই তাঁর কথা। কেউ বলছেন, লোকটা আসলে মাফিয়া। কেউ বলছেন, একটু গ্যাস খেতে ভালবাসে। কেউ বলছেন, লোকটা একটু ছবি টাঙাতে ভালবাসে, কিন্তু মনটা ভাল। কেউ বললেন, মুনমুন সেনের পেছনে সেঁটে আছে, ধারেকাছে কাউতে ঘেঁসতে দিচ্ছে না।

বুঝলাম, লোকটা বিত্তশালী। লোকটা প্রভাবশালী। বুঝলাম, এইমুহূর্তে জেলার তৃণমূলটাকে এই ভদ্রলোকই চালাচ্ছেন। ডিএম-এসপি তাঁর কথাতেই ওঠাবসা করেন। ফোন নম্বর জোগাড় করে ফোন করেই বসলাম। বললাম, কাল সকালে একটু দেখা করতে চাই। উনি প্রথমে একটু ভাও দেখালেন। বলেলন, 'কাল মিটিং আছে। অন্যদিন আসুন।' এমন কথা কত শুনেছি। কীভাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হয়, ততদিনে ভালই শিখে গেছি। বললাম, 'বাঁকুড়ায় এসেছিলাম ইলেকশন কভার করতে। কিন্তু নানা জায়গায় ঘুরে যা বুঝলাম, আপনিই হলেন আসল লোক। ক্যান্ডিডেট না হলেও আসল

ক্যান্ডিডেট আপনিই। কলকাতার অফিসও বলে দিয়েছে, আপনিই হলেন বাঁকুড়ার আসল লোক। আপনার সঙ্গে যেন অবশ্যই দেখা করে আসি।' কাজ হচ্ছে। তিনি তখন গ্যাসে বিগলিত হচ্ছেন। পরের দিন সকালে সময় দিয়েই দিলেন।

সকাল আটটায় স্কুলডাঙায় তাঁর বাড়িতে যেতেই দেখা গেল একঘর লোক। জেলার নানা প্রান্ত থেকে এসেছেন। তিনি একেকারে দরবার সাজিয়ে বসেছেন। পরিচয় দিতেই নিয়ে গিয়ে বসালেন পাশের ঘরে। বাইরের হলঘর সামলানোর দায়িত্ব অন্য এক অনুগামীকে দিয়ে এলেন 'সাক্ষাৎকার' দিতে।

কয়েকটা সংলাপ তুলে দেওয়া যাক।

আমি— সবার মুখেই তো ঘুরেফিরে আপনার কথা। সবাই বলছে, আপনারই প্রার্থী হওয়া উচিত ছিল।

অরূপ— কী যে বলেন! দিদিও বলেছিল, তোকেই দিল্লি পাঠাতাম। কিন্তু তুই চলে গেলে

এতবড় জেলাটা কে সামলাবে! এই জেলায় এত কাজ করতে চাইছি। তোকেই তো এইসব উন্নয়নের কাজ করতে হবে। এখানে একজন অনেস্ট লোক দরকার। এমপির আর কাজ কী? সেজেগুজে দিল্লি যাওয়া। তোর কাজ হবে জেলাটাকে নতুন করে গড়ে তোলা।

আমি— আপনাকে দিদি তাহলে খুব ভরসা করেন!

অরূপ— হ্যাঁ, তা করেন বইকি। এই যে আমার জেলায় এতগুলো এমএলএ। সবগুলো একেকটা — (লেখা গেল না)। ওদের দিয়ে কিস্যু হবে না। এটা দিদি বোঝেন। তাই তো আমাকেই পুরো দায়িত্ব দিয়েছেন। এই যে ইউনিভার্সিটি হচ্ছে। পুরো জমিটা আমি দিয়ে দিলাম। আর কেউ দিতে পারবে? দিদি বলে দিয়েছে, মুনমুন সেনকে জেতানোর দায়িত্ব তোর।

মাঝে মাঝেই ফোন আসছে। কখনও কেটে দিচ্ছেন। কখনও ধরছেন। এক বিধায়কের ফোন এল। একটু সময় চেয়ে নিলেন। ওদিকে, সেই বিধায়ক কী বলছেন, শোনা গেল না। তবে এদিকের উত্তর শুনে বেশ বোঝা গেল। এদিকের উত্তরগুলোই তুলে ধরা যাক।

— ওরে হব্যাক হব্যাক। চিন্তা করিস না। পরশু ক্যান্ডিডেট আসবেক। কুথায় কবে প্রোগ্রাম, ঠিক হোক।

— ওরে, তোর এলাকায় নিশ্চয় যাবেক। তাই কি না যায়! আগে ইদিকটা হইয়ে যাক।

— কী বললি, মুনমুন সেনকে তোর ঘরে খাওয়াবি! এখন থিসে এত মাতিস না। তুর ঘরে গেলে বাকিরা কী দোষ করল! বাকি লোকগুলা তখন ঝুঁক ধরব্যাক, তাদের ঘরেও খা'তে হব্যাক। মুনমুন সেন কি সবার ঘরে খাইয়ে বেড়াবেক? তাহলে পচারটা করবেক কখন?

— ও। তুর অনেক আশা ছিল? ত, আশাটা তো পালাই যাচ্ছে নাই। একবার ভাল করে জিতা। তারপর পাঁচ বছর তো ইখানকার এমপি থাকবেক। তখন তো বারবার আসবেক। তখন তুর ঘরে খাওয়াই দুব।

— ও, মুনমুন হ'ল। ইবার রিয়া-রাইমাকে চাই। শালা। তুদের লোভের শেষ নাই। কুনদিন বলববি মাধুরী দীক্ষিৎকে তুর ঘরে খাওয়াবি। শালা, উয়ারা কী খায় জানিস?

— হ্যাঁ, কী বললি? মিঠুনকে লিয়ে যাব? মিঠুন কি আমার বাবার চাকর বটে! উটা দিদি দেখছে। কাকে কখন কুথায় পাঠাবেক। মুনমুন সেনেরটা আমি ঠিক করব। মিঠুন, দেব ইয়ারা কে কবে আসবেক, সব উপর থিকে ঠিক হবেক। উটায় আমার কিছু করার নাই। যদি তুর উখানে হয়তো, হব্যাক। চিন্তা করিস না, কেউ না কেউ যাবেন। যত খুশি ছবি তুলে লিবি। ঘরে টাঙাই রাখবি। এখন ঘরে টাঙা। পরে তুর ঘরে খাওয়াই দুব।

****

ফোন পর্ব শেষ হল। তারপর হেঁসে বললেন, 'দেখলেন তো। সবাই চাইছে মুনমুন সেনকে

তার বাড়িতে খাওয়াতে। আমি আমার বাড়িতেই এখনও খেতে বলিনি। আগে ভোট পেরিয়ে যাক। তারপর দেখা যাবে।'

আগেরদিন যাওয়া হয়েছিল ছাঁদারের দিকে। সেখানে গিয়ে শোনা গেল হাতির হানার কথা। হাতির আতঙ্কে সন্ধে থেকে মানুষ নাকি বাইরে বেরোতেই পারছে না। রাতের বেলায় হাতির দল এসে ঘর ভেঙে দিচ্ছে। একে-তাকে মেরে ফেলছে। আতঙ্কে রাতে পাহারা দিচ্ছে গ্রামবাসী।

একটা সিগারেট ধরিয়ে আলতো একটা হাসি হাসলেন অরূপ কুমার। একটা টান দিয়ে বললেন, ওটার সমাধান করে ফেলেছি। পরেরবার আসবেন। দেখবেন, আর কোনও হাতি আসছে না।

— সে কী? হাতিকেও বশ করে ফেলেছেন?

অরূপ কুমার: আপনারা আসল কারণটা বুঝছেন না। অবশ্য আপনাদের আর দোষ কী? ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টই ভাবেনি। ডিএম-এসপিরাও ভাবেনি।

— আসল কারণটা তাহলে কী?

অরূপ কুমার: হাতি কেন বাইরে আসে বলুন তো? ওর কি শখ যায়? আসলে, জঙ্গলে ও ঠিকমতো খাবার পায় না। সেই কারণেই বাইরে চলে আসে। এটা আটকানোর একটাই উপায়। জঙ্গলে ওর খাবারের ব্যবস্থা করা। খোঁজ নিয়ে দেখলাম, হাতি কলা গাছ খেতে

খুব ভালবাসে। ডিএম-কে বললাম, জঙ্গলের ভেতর দশ লাখ কলা গাছ লাগিয়ে দিন। হাতি কত খাবে, খাক। আর ওর বাইরে আসার দরকারই হবে না।

— এটা তো দারুণ আইডিয়া। এটা তো ডুয়ার্সেও ফলো করতে পারে। ওখানেও তো খুব হাতির উৎপাত।

ফের একটা যুদ্ধজয়ের হাসি হাসলেন মহানায়ক অরূপ কুমার। আরেক টান দিয়ে বললেন, 'এই আইডিয়াটা বলতেই ডিএম চমকে গেল। বলল, আপনি যেটা ভেবেছেন, এটা কেউ ভাবতে পারেনি। শুধু ডুয়ার্স কেন, দেখতে থাকুন। সারা দেশে এটা চালু হয়ে যাবে। হাতে তো সব জায়গাতেই এমন প্রবলেম করে। দিদিকে বলেছি। দিদি তো দারুণ খুশি। ভাবতে পারছেন, হাতির এই প্রবলেম আটকাতে পথ দেখাবে বাঁকুড়া।

— যেদিকে যাচ্ছি, শুধু আপনার ছবি। নানা ভঙ্গিমায়।

অরূপ কুমার: কে কোথায় কী ছবি টাঙিয়ে দিচ্ছে। সবার হাতেই ফোন। যে পারছে ছবি তুলছে। ফ্লেক্স বানিয়ে দিচ্ছে। লোকে যদি ভালবেসে টাঙায়, আমার কী করার আছে? কজনকে বাধা দেব? যে যা পারছে করুক। খারাপ তো করছে না।

— কিন্তু আপনার নামে তো কয়লা পাচার থেকে শুরু করে নানা অভিযোগ উঠছে। বাসুদেব আচারিয়া তো বললেন, আপনিই এর পান্ডা।

অরূপ কুমার: বাসুবাবু এই কথা বলছে নাকি! তাহলেই ভাবুন, আমি কোথায় পৌঁছে গেলাম। সবাই মিলে আমাকে হিরো বানিয়ে দিল। বাসুবাবু আমার নামে কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি লিখছে। আমার স্ট্যান্ডার্ডটা কোথায় পৌঁছে গেল, ভেবে দেখেছেন! আসলে, কী জানেন তো, ঈর্ষা। আমাকে সবাই ভালবাসে। এত এত মানুষ করে খাচ্ছে। এটা ওদের পছন্দ হচ্ছে না। আরে বাবা, আমি তো ক্যান্ডিডেট নই। আমার নামে এত বলার কী আছে!

এভাবেই কথাবার্তা চলতে লাগল। একের পর এক স্মরণীয় বাণী উপহার দিয়ে গেলেন অরূপ কুমার। সেবার মুনমুন জিতলেন। বছর পাঁচেক সত্যিই তাঁকে একরকম আগলে রাখলেন অরূপ কুমার। সাংসদ কোথায় যাবেন, কোথায় যাবেন না, কী বলবেন, সবই ঠিক করতেন তিনি। এরই মাঝে ২০১৮-র পঞ্চায়েত ভোট, সভাধিপতি সিট হয়ে গেল এসটি সংরক্ষিত। ফলে, তাঁর আর সভাপতি হওয়া হল না। ২০১৯ এ টিকিট পেলেন না। পাঠিয়ে দেওয়া হল সুব্রত মুখার্জিকে। ২০২১ এ বিধানসভায় টিকিট পেলেন তালডাংরায়। এবার দীর্ঘ আড়াই দশক পর আবার ভূমিপুত্রে ভরসা রেখেছে তৃণমূল। অবশেষে শিঁকে ছিড়ল মহানায়ক অরূপ কুমারের।

এখন আবার সাক্ষাৎকার নিতে গেলে তিনি কী বলবেন, জানা নেই। তবে, দশ বছর আগের সেই স্মৃতি কিছুটা তুলে ধরা গেল। যা বোঝার বুঝে নিন।

মেঘের তালে ছায়ার তালে

সৌরভ নায়েক

ঘুরে নেওয়া যাক পশ্চিম সিকিমের ছোট্ট একটা গ্রামে। নাম "ছায়াতাল"। শ্রীজুংগার মুর্তির পাদদেশে একটি লেককে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একটা আদি জনপদ। লেকের নাম অনুসারেই এই জায়গার নাম। নিচে হি-বাজার থেকে শুরু করে পাহাড়ের ঢালুতে এর অবস্থান। সকালে দেখতে পাবেন স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রা, ফুলের মতো বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়া। কাঞ্চনজঙ্ঘার কোলে বেড়ে ওঠা মানুষ গুলোর মনটাও পাহাড়ের মতই বিশাল।

এবার সবার আগে যে প্রশ্নটা জাগে—কীভাবে যাব? নিউ জলপাইগুড়ি অথবা বাগডোগড়া থেকে রিজার্ভ গাড়িতে সময় লাগে ৪:৩০ – ৫ ঘণ্টা। এছাড়াও শেয়ার গাড়িতে শিলিগুড়ি বাসস্ট্যান্ড থেকে জোরথাং পর্যন্ত

এসে এই স্ট্যান্ড থেকে হি-পাতালের গাড়িতে সরাসরি আসা যায়। অথবা ডেন্টাম / হি-বাজার পর্যন্ত এসে লোকাল ট্যাক্সি নিয়েও পোঁছানো যায়। যাওয়ার সময় রাস্তায় পড়বে জোরথাং, সোরেং বাজার, কালুক, বারমিয়োক।

কী কী দেখবেন?

ছায়াতাল লেক, রবীন্দ্র স্মৃতি বাংলো, হি ওয়াটার গার্ডেন, সিংসর ব্রিজ, ডেন্তাম ভ্যালি, উত্তরে ভ্যালি, এলপাইন চিজ ফ্যাক্টরি, ট্রাউট ফিশ রেয়ারিং সেন্টার, রিশম মনাস্ট্রি, রিনচেনপং মনাস্ট্রি। ছায়াতাল হেরিটেজ হোমস্টে থেকে কয়েক পা উঠলেই পেয়ে যাবেন বার্সে রডোডেন্ড্রন স্যাংচুয়ারির রেডপান্ডা গেট। সেখানে চাইলে জংলে কিছুটা ঘোরাঘুরি করা যায় অথবা একটা জাংগলট্রেকিং করে নেওয়া যায়।

পশ্চিম সিকিম এর ওখরে, হিলে-ভার্সে, বুরিয়াখোপ এবং দক্ষিণের কিছু অংশ যেমন নামচি, রাভাংলা, কিটম পাখিরালয় ঘোরা যায় ছায়াতালকে কেন্দ্র করে। এছাড়াও এখান থেকে পেলিং মাত্র ২৮ কিমি। সঙ্গে যোগ করে নেওয়া যায় ইয়ুকসাম।

কোথায় থাকবেন?

প্রায় ৭৫ বছরের পুরানো একটা তিব্বতি ধাঁচের বাড়ি যেটা এখন হোমস্টের রূপ নিয়েছে, নাম "ছায়াতাল হেরিটেজ হোমস্টে", তবে বাইরে থেকে বোঝা মুশকিল যে, ভেতরের সমস্ত ব্যবস্থা আধুনিক মানের, আর এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার রেঞ্জ গুলি খুবই ভাল দেখা যায়। চারিদিকে বড় এলাচ বাগান দিয়ে ঘেরা, গাছের ডালে এবং এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় নানা রঙের নাম না জানা পাখি এবং প্রজাপতির দল। এছাড়াও খুজে পাবেন প্রচুর রঙিন অর্কিড। মার্চ-মে মাসে পাবেন লাল রঙের ফুলে ঢাকা রডোডেন্ড্রন গাছ। আর সেই পড়ে থাকা ফুল মাড়িয়েই পৌঁছতে হয় এখানে। গরম চায়ে চুমুক দিতে দিতে এই প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার মজাটাই আলাদা।

তবে বলে রাখা ভাল গাড়ি থেকে নেমে বেশ খানিকটা সিড়ি বেয়ে পৌঁছতে হয় এই হেরিটেজ হোমটিতে। তবে পৌঁছবার পর এখানকার মনোরম আবহাওয়া আপনার সমস্ত ক্লান্তি দূর করে দেবে।

সেই হোম স্টে বুকিংয়ের নম্বর
8017633239 / 9830133833

তাকদার সেই ব্রিটিশ বাংলোয়

স্বরূপ গোস্বামী

এখানে গেস্ট হাউস? কে থাকতে আসবে এই জঙ্গলে? কেনই বা আসবে?

ছেলের দিকে ঠিক এই প্রশ্নটাই ছুঁড়ে দিয়েছিলেন প্রবীণ মাস্টারমশাই।

ছেলেও নাছোড়। এখানে তিনি গেস্ট হাউস বানিয়েই ছাড়বেন। ঠিকঠাক প্রোমোট করতে পারলে ট্যুরিস্ট ঠিক আসবে।

বাবা-ছেলের এই কথোপকথনটা মোটামুটি বছর পনেরো আগের। পনেরো বছর পরের ছবিটা অবশ্য বাবা-ছেলে দুজনের পক্ষেই বেশ স্বস্তিদায়ক। হ্যাঁ, সত্যিই এখানে ট্যুরিস্ট আসছেন। সেই চাহিদা এতটাই যে অনেক পর্যটককে নিরাশ হতে হচ্ছে।

আসলে, এই তাকদা শহরের সঙ্গে একটা ইতিহাস জড়িয়ে আছে। একদিকে পাইনের বন থেকে ভেসে আসছে মেঘের সারি। অন্যদিকে, সেই ইতিহাসের হাতছানি। সবমিলিয়ে জায়গাগা বেশ রোমাঞ্চকর।

পাহাড়ের নানা জায়গায় পায়ের ছাপ পড়েছে ইংরেজদের। তাঁরা যত্ন করে সাজিয়েছেন বিভিন্ন জনপদকে। ওই দুর্গম এলাকায় রেললাইন পাতা, রাস্তা তৈরি করা, স্কুল-কলেজ তৈরি করা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। বরং স্বাধীনতার পর আমরা নিজেদের চেষ্টায় কতটুকু এগোতে পেরেছি, সেই প্রশ্নটাই যেন বড় হয়ে ওঠে।

তাকদায় এলে ব্রিটিশ স্থাপত্য যেন আরও বেশি করে মন কেড়ে নেয়। এখানে সেনাবাহিনীর আলাদা ক্যান্টনমেন্ট তৈরি করেছিল ব্রিটিশরা। মোটামুটি ১৯০৫ থেকে ১৯১১ এই সময়ের মধ্যে তৈরি হয় একের পর এক কীর্তি। তৈরি হয় সতেরোটি হেরিটেজ বাংলো। কোনওটি এখন বিলুপ্ত। কোনওটার ভগ্নদশা। কোনওটি হয়েছে স্কুল, কোনওটি গেস্ট হাউস। এভাবেই ইতিহাসের গন্ধ গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে আছে এইসব স্থাপত্য।

ইচ্ছে ছিল, কোনও একটা হেরিটেজ বাংলোয় থাকার। সেখানকার ইতিহাসটাকে একটু ছুঁয়ে দেখার। সেই তাগিদ থেকেই তাকদায় যাওয়ার ইচ্ছে। ইউটিউবের সৌজন্যে বেশ কয়েকটা বাংলোর হদিশ পাওয়া গেল। কোনওটার আকাশছোঁয়া ভাড়া। কোনওটায় আবার বুকিং নেই। সবমিলিয়ে জায়গা হল সাইনো গেস্ট হাউসেই। ইউটিউবের ভিডিও দেখে প্রাথমিক একটা ভাল লাগা তৈরি হয়েছিল। বাকিটা তো গিয়েই বুঝতে হবে।

তাকদা যাওয়ার রাস্তাটা বেশ উপভোগ্য। দুধারে পাইন গাছের সারি। মেঘ ভেসে আসছে। দিনের বেলাতেও কেমন একটা গা ছমছমে অনুভূতি। এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার রোমাঞ্চই আলাদা। দার্জিলিং থেকেও আসা যায়। আবার কালিম্পং থেকেও আসা যায়। দুদিক থেকেই মোটামুটি ঘণ্টা দেড়েকের পথ। সব বাংলোগুলোই রাস্তা থেকে অনেকটা উপরে। সাইনোও তাই। সামনে লন। বিরাট বারান্দা। ফায়ারপ্লেসের চিমনি, দরজা-জানালাই জানান দিয়ে যাচ্ছে, বাংলোটা কত পুরনো। লনেই দুদিকে রয়েছে ফোয়ারা। আধুনিক অঙ্গশয্যা নয়, ইতিহাসেরই গন্ধ মাখা। কিন্তু আমাদের বিধি বাম। যাওয়ার পর থেকেই ঝিরঝির বৃষ্টি। ফলে, বাইরে বেরোনোর তেমন উপায় নেই। অবশ্য শুধু বৃষ্টি উপভোগ করতে হলেও তাকদার এই বাংলো আদর্শ। আপনমনে বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখুন, বই পড়ুন, গান শুনুন বা গুনগুন করে গেয়ে উঠুন। আলস্য যাপনের এমন সুযোগ খুব বেশি আসে না। পাহাড় মানেই তো শুধু চড়াই উতরাই নয়। এমন বাংলো তো আলস্যকেই আমন্ত্রণ জানায়।

নিচের চারটে ঘর পর্যটকদের জন্য। ওদিকের দুটো ঘর কিচেন আর ডাইনিংয়ের কাজে ব্যবহার হয়। ওপর তলায় থাকেন প্রবীণ দম্পতি। দুই কেয়ারটেকার নিরন আর রোশন। নিরনের বাড়ি মালবাজারে। বেশ লাজুক। রোশনের গানের গলাটা চমৎকার। গলায় ক্লাসিকাল টাচ। কঠিন কঠিন গানগুলোকেও কী নিখুঁত সুরে গাইছে। আমাদের ঠিক পাশের ঘরেই ছিল এক নবীন দম্পতি। দেবমাল্য আর দেবাঞ্জলি। দুজনেই কৃতী ইঞ্জিনিয়ার। বেশ প্রাণবন্ত জুটি। দাম্পত্য আর নিবিড় বন্ধুত্ব যেন হাত ধরাধরি করে হাঁটছে। সন্ধে থেকে তাঁদের সঙ্গে নানা বিষয়ে গল্প করে দিব্যি কেটে গেল।

বেড়ানোর সঙ্গে খাওয়ার একটা অনুষঙ্গ না থাকলে তা পূর্ণতা পায় না। পাহাড়ে গিয়ে ক্যালোরির হিসেব চুলোয় যাক। নিরন বা রোশনের হাতের সেই সুন্দর রান্নাকে অসম্মান করার কোনও স্পর্ধা নেই। দুপুরে বাঙালি আদলে, রাতে কিছুটা চৈনিক সংস্কৃতি। সবমিলিয়ে বেশ উপভোগ্য। ইচ্ছে ছিল, ভোরের দিকে যদি কোথাও বেরোনো যায়। নিদেনপক্ষে উপরের গুম্পায়। কিন্তু কোনওটাই হল না। কারণ, ঘুম ভাঙল বেশ দেরিতে। মেঘ একটু একটু করে সরেছে। দূরের পাহাড়গুলো একটু একটু করে স্পষ্ট হচ্ছে। ওই তো, ওই দিকটায় তিনচুলে। ওই যে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে রংলি রংলিয়ট চা-বাগান।

কিন্তু এই বাংলোর ইতিহাসটাই তো জানা গেল না। কে বলতে পারেন? ফোনে যাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছিল, সেই আনন্দজি

থাকেন কার্শিয়াংয়ে। বেচারা নিরন বা রোশনের পক্ষে এত ইতিহাস জানা সম্ভব নয়। একমাত্র উপায়, আনন্দজির বাবা। প্রবীণ ওই মানুষটিকে বেশ কয়েকবার দেখেছি। বেশ সাহেবি চেহারা। দূর থেকে দেখেই বেশ সমীহ জাগছে। এই বয়সেও বেশ সক্রিয়। বেশ কয়েকবার নিচে নামলেন। এদিক-ওদিক হেঁটে বেড়ালেন। ইচ্ছে হল, তাঁর কাছেই দু-চার কথা শুনি। কিন্তু তখন তিনি ব্যস্ত ছিলেন। বললেন, একটু পরে আসছি।

একটু পরে এলেন। কথা বলে গেলেন মূলত হিন্দি আর ইংরাজিতে। তবে বাঙালি নামগুলো উচ্চারণ করলেন একেবারে নির্ভুল বাংলা উচ্চারণে। তাঁর কাছে যা যা জানলাম, সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। এখানে শুধু তার নির্যাসটুকুই লেখা যায়। তাঁর বয়ানেই বাকিটা শোনা যাক। ১৯০৫ নাগাদ এখানে ক্যান্টনমেন্ট তৈরি হয়। এরকম ১৭টি বাংলো বানানো হয়েছিল। তখন ছিল মাটির রাস্তা। গাড়ির তেমন চল ছিল না। তাই গাড়ি ওঠার আলাদা রাস্তা তৈরি হয়নি। এই ক্যান্টনমেন্টের সৈন্যদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। তারপর অবশ্য আলাদা করে এই ক্যান্টনমেন্টকে তেমন সক্রিয় করা হয়নি। ইংরেজটা ঠিক করলেন এই বাংলোগুলো নিলাম করবেন। কিন্তু এই পাহাড়ে কেই বা সেই বাংলো কিনবেন? তাই নিলাম হয়েছিল কলকাতায়। কলকাতার বড় বড় ব্যবসায়ী, উকিল, ডাক্তার, জমিদাররাই সেইসব বাংলো কিনলেন। বেশিরভাগ বাংলোর মালিক হয়ে গেলেন কলকাতার দিকপালরা।

প্রথম প্রথম তাঁরা ছুটি কাটাতে আসতেন। কিন্তু তারপর যা হয়! আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। এই সাইনো বাংলোর আগের

নাম ছিল চন্দ্রা ভিলা। যিনি কিনেছিলেন, তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল চন্দ্রাবতী দেবী। স্ত্রীর নামেই বাংলোর নামকরণ। সেখান থেকে হাতবদল হল। কিনলেন যাদবপুরের এক মহিলা। কিন্তু তিনিও তেমন আসতেন না। আমি তখন এখানে হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতাম। আমি একদিন তাঁকে বললাম, আপনারা তো তেমন আসেন না। বাংলোটা এভাবেই পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে থাকে। উনি বললেন, আপনি কিনে নিন। আমার তেমন সামর্থ্য কই? তার মধ্যেও যতটা সম্ভব জোগাড় করে এই বাংলোটা কিনে নিলাম। কিছুটা মেরামত করে এখানেই থাকা শুরু করলাম। কিছু প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বাংলোর স্থাপত্যকে, সাবেকিয়ানাকে ধরে রাখতে চেয়েছি।

কিন্তু সেই পরিত্যক্ত বাড়ি কীভাবে হয়ে উঠল এই সাইনো গেস্ট হাউস? প্রবীণ তাসি মোক্তান জানালেন, ‘এটা আদৌ গেস্ট হাউস হবে কিনা, আমার মনেই সংশয় ছিল। আমি ছেলেকে বলেছিলাম, এখানে কেউ থাকতে আসবে না।’ কিন্তু ও বলল, এই বাংলোর একটা ইতিহাস আছে। ভিউটাও দারুণ। ঠিকভাবে প্রোমোট করতে পারলে অনেকেই এখানে আসবে। যা করার, আমার ছেলেই করেছে। পুরো কৃতিত্বই ওর। আমাদের বয়স হয়েছে। আমরা এসব ব্যাপারে খুব একটা জড়াই না। তবে এই বাংলোর প্রচারের ব্যাপারে একজন বাঙালির কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ। তিনি হলেন ভ্রমণ পত্রিকার সম্পাদক অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি একবার এসে পনেরোদিন এই বাংলোয় ছিলেন। তিনি এই বাংলো নিয়ে লিখলেন, আরও অনেককে এখানে আসার পরামর্শ দিলেন। তারপর থেকে লোক আসা-যাওয়া বাড়তেই লাগল।

সাতাশি বছরের প্রবীণ মাস্টারমশাইয়ের গল্প বলার ধরনটা বেশ আকর্ষণীয়। কীভাবে এই বাংলোর সাবেকিয়ানাকে তিনি ধরে রেখেছেন, সেটা শুনলে সত্যিই কুর্নিশ করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আমাদের বুকিং তো মাত্র একদিনের। তাকদাকে বিদায় জানিয়ে চলে যেতে হবে অন্য ঠিকানায়। সবকিছু গোছগাছ করে যখন নামছি, ইচ্ছে হল ওই প্রবীণ মানুষটির সঙ্গে একবার দেখা করে যাওয়ার। যদি আর কখনও দেখা না হয়! আমাদের অবাক করে উনি চিৎকার করে পরিষ্কার ঝরঝরে বাংলায় বললেন, ‘আশা করছি, আবার দেখা হবে।’

হ্যাঁ, তাকদার প্রতি এই ভালবাসা একদিনে ফুরোনোর নয়। তাই মেঘ মাখা এই ছোট্ট পাহাড়ি গ্রামে আবার আসতেই হবে। এই তাকদার পরতে পরতে আরও কত অজানা ইতিহাস লুকিয়ে আছে। প্রবীণ ওই মাস্টারমশাইয়ের কাছে আরও কত গল্প শোনার আছে। আপাতত, গুডবাই তাকদা।

বেঙ্গল টাইমস

২৫ মার্চ, ২০২৪

- জোটে এত জট কেন?
- কুকথার স্রোত কে থামাবে?
- গঙ্গার নীচে মেট্রো যাত্রা
- বোর্ডকে কে শাস্তি দেবে
- পলাশ দেখেই ছুটবেন না

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন। সম্পাদকীয় কার্যালয়: কেবি ১২, সেক্টর ৩, সল্টলেক, কলকাতা ১০৬। ফোন ৯৮৩১২২৭২০১। ই মেল: bengaltimes.in@gmail.com
ISSN 2445 5657 ওয়েবসাইট bengaltimes.in

সম্পাদক: স্বরূপ গোস্বামী